গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্..." কথাটি বহু কালের ফলিত সত্য হলেও, প্রকৃত শ্রদ্ধার মূল্য কি আজ বর্তমান? একটি নির্দিষ্ট দিনকে কেন্দ্র করে সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি প্রতি বছর। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অর্থ যে কি সেটা আমাদের মধ্যে ক'জন বুঝি? সে শিক্ষা মানুষকে হিংসা ও হীনমন্যতা থেকে মুক্ত করে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে গড্ডলিকা প্রবাহে চলা মানে দৃষ্টিহীন কীটাণুর পথ অনুসরণ করাই হয়...

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৪
সেপ্টেম্বর ২০২১

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, দীপঙ্কর সরকার, রিয়া মিত্র, সুনৃতা রায় চৌধুরী, পল্টু ভট্টাচার্য, অমিত নাগ, হাজেরা বেগম এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

স্মৃতির পানে সংখ্যা

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

এগিয়ে চলে জীবন-নদী, পথ হারিয়ে তেপান্তরে...
ছড়িয়ে থাকে স্মৃতির কণা, ফেলে আসা পথপ্রান্তরে।

(নীলাঞ্জনা)

পুরানো স্মৃতি, পুরানো সময় – সব কিছু বদলে গেলেও, এর অস্তিত্ব কিন্তু বিলীন হয় না। জীবন প্রবাহমান। আর এই প্রবাহমানতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার নামই অগ্রগতি। তবে এগিয়ে চলা মানে এই নয় যে পুরানো ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেওয়া। কারণ পুরানো বা ফেলে আসা জীবনের মধ্যেই সুপ্ত থাকে আমাদের ভবিষ্যৎ। বর্তমান যেমন আমাদের অনেক নতুন কিছু উপহার দিচ্ছে, তেমনি কেড়ে নিয়েছে বা বিলীনের পথে ঠেলে দিয়েছে আমাদের জীবনের পুরানো অনেক মূল্যবান উপাদানসমূহকে। কিন্তু সেই পুরানো ছোট ছোট স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখার জন্যই 'গুঞ্জন'-এর এই সংখ্যাটি 'পুরানো দিনের কথা'কে (স্মৃতির পানে) নিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

আশা করি সকলের খুব ভালো লাগবে। সকল সুপাঠক-পাঠিকার কাছে বিষয়টি যেমন মনোগ্রাহী হবে, তেমনি তাঁরা ক্ষণিকের তরে ফিরে যেতে পারবেন তাঁদের ফেলে আসা দিনগুলোতে। বলা যায়, তাঁরা স্মৃতি রোমন্থনের রস আস্বাদন করতে পারবেন অনায়াসে।

সমস্ত পাঠক ও পাঠিকাদের মূল্যবান মন্তব্যের অপেক্ষায়...

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন
বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন
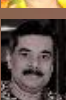
পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

কলম হাতে

ছবির নামঃ বিশ্বকর্মা পূজার দিনে...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

শ্রদ্ধাঞ্জলি

৺শ্রী বুদ্ধদেব গুহ

জন্মঃ ২৯ জুন ১৯৩৬ প্রয়াণঃ ২৯ অগাস্ট ২০২১

ভাবতেই পারছি না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পর ভারতের জঙ্গল সুন্দরীদের পটভূমি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে একের পর এক রোমান্টিক গল্প ও উপন্যাসের স্রষ্টা হওয়ার গুরু দায়িত্ব যিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, সেই মানুষটি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

অনেকেই হয়তো জানেন না, লালা দা নামে পরিচিত এই মানুষটি জীবনের বেশ কয়েকটি বিপরীতমুখী পথে সমান দক্ষতার সাথে পদচারণ করেছিলেন। বানিজ্য (চ্যাটারড

অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে) আর সৌন্দর্য এই দুই ভিন্ন পথের ওপর দিয়ে চিরকাল স্বচ্ছন্দে হেঁটে গেছেন আদরণীয় বুদ্ধদেব গুহ মহাশয়। যদিও তাঁর স্ত্রী ঋতু গুহ রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে সুবিশেষ রূপে পরিচিতা ছিলেন, লালা দা-র কণ্ঠের রবীন্দ্র সঙ্গীতও এক অনন্য মাত্রার সৃষ্টি করত। একদিকে প্রকৃতি প্রেমিক অন্যদিকে ছিল তাঁর শিকারের নেশা। সেই নেশায় ছুটে গেছেন সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত। এমন মানুষের মূল্যায়ণের যোগ্যতা আমাদের নেই।

তাই শুধু বলবঃ

'টুঁই' পাখিটা হঠাৎই যেন ফাঁকি দিয়ে নীলাকাশে উড়ে গেল। বাংলা সাহিত্যের আকাশ সত্যিই আবার যেন আর এক বিশাল শূন্যতার হাহাকারে মুষড়ে পড়ল... ■

'গুঞ্জন'এর ২০২১ এর বাকী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

অক্টোবর – পূজা সংখ্যা

নভেম্বর – দীপাবলি সংখ্যা

ডিসেম্বর – অণু সংখ্যা

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

পঞ্চম পর্যায় (১)

২০১৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বোম্বে মেলে চেপে ১৯ তারিখে এলাম ইটাশ্রী। ওখান থেকে হোসেঙ্গাবাদে রাতে থেকে সকালে রেবাবানখেড়ি যেতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল।

আমরা চারজন, অর্থাৎ আমার সাথে কাকাজী ও অশোক দাসজী তো আছেনই সঙ্গে আমার সহকারী সঞ্জয় ও চলেছে নতুন অভিজ্ঞতার খোঁজে। এখানেই আমরা গতবার পরিক্রমা শেষ করে ছিলাম। তাই খণ্ড পরিক্রমার রীতি অনুসারে এখান থেকেই শুরু করতে হবে। আমাদের আগেই দিব্যানন্দজী রাম মন্দিরে মদনমোহনজীর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। আরও একজন বাঙালী পরিক্রমাকারী এবার এসেছেন। আমরা কয়েকজন বাঙালী আসছি শুনে উনি আজকে থেকে গেছেন।

গতবার অসুস্থতার জন্য চারপাশটা দেখা হয়নি। আমার এক বন্ধু বার বার করে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন আশেপাশে যা দেখার আছে সেগুলো যেন অবশ্যই দেখে তাঁকে জানাই। মদনমোহনজীর জন্য কলকাতার রসগোল্লা নিয়ে গেছিলাম। সেটি পেয়ে ওনার মুখে যে শিশুর সারল্য

দেখলাম তা ভোলার নয়। ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের কথায় সাধুর মুখ হবে শিশুর মতো সরল। মদনমোহনজীর মধ্যে সেই সারল্য দেখে বুঝলাম প্রকৃত সাধু দর্শনের মধ্যে দিয়েই এবারের যাত্রা শুরু হল।

বাঙালী পরিক্রমাকারীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা পাশেই আর এক বাঙালী সাধুর প্রতিষ্ঠিত ঋণমুক্তেশ্বর মহাদেব এবং মা ভবতারিনীর দর্শন করলাম। যদিও সাধুটি বর্তমানে নর্মদা পরিক্রমায় বেড়িয়েছেন। ফিরে এলাম রাম মন্দিরে। মা নর্মদার আরতি করে ক্লান্ত শরীরটাকে কম্বলের ওপর এলিয়ে দিলাম। আর এক ঘুমেই ভোর হল।

আজ সোমবার ২০শে ফ্রেব্রুয়ারী সকালে নর্মদায় স্নান করে আরতি করে পরিক্রমা শুরু করলাম। সঙ্গে সঞ্জয়ও রয়েছে, আর হাজারো প্রশ্ন করে চলেছে। আস্তে আস্তে কুয়াশা কেটে সূর্যদেবকে দেখা যাচ্ছে। দু-পাশে ফসলে ভরে আছে। আমরা চাষের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। এলাম ঈশ্বরপুর গ্রামে। এখানে রাইন নদীর সাথে নর্মদার সঙ্গম হয়েছে।

নদীর পাড় ধরে হাঁটা কিন্তু সূর্যের তেজ ততটা না হওয়ার জন্য কষ্ট কম হচ্ছে। এলাম পামনি গ্রামে। এখানে পালকমতি নদী নর্মদায় মিশেছে। নদীর পাড়ে গাছের তলায় একটু বিশ্রামের জন্য বসে পড়লাম। পাশেই একটি হনুমান মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে প্রণাম করে আবার পথ চলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় একটি লোক, নাম দশরথ

গুর্জব, দুপুরে তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু এখন তো সবে সাড়ে এগারোটা কিছুতেই লোকটিকে বোঝানো গেল না যে, আমাদের পথ অতি দীর্ঘ্য। এত তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্নাবকাশ নিলে চলায় বিঘ্ন হবে।

দুপুর একটা। দশরথ গুর্জবের বাড়ি থেকে চলা শুরু করলাম। মাঠের পথ — দু'দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু বাড়ি আছে। কিছুটা যাওয়ার পর নর্মদার তটের কাছাকাছি দেখলাম দ্রৌপদী প্রতির্ষ্ঠিত শিব মন্দির। শুনলাম বনবাস কালে দ্রৌপদী এই শিবের পুজো করতেন।

শুরু হলো চড়াই-এর পথ। রুক্ষ মাটি, তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। এবার নামতে হল, সামনেই একটি শাখা নদী – যার নাম মারু। এখানে সে নর্মদায় মিলিত হয়েছে। খুব সাবধানে এই খরস্রোতা নদী পেড়িয়ে পাড়ে উঠতেই দেখলাম, বিশাল এক বড়ো গোঁফের অধিকারী এক দীর্ঘদেহী সত্তরোর্দ্ধ ব্যক্তি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই একই অনুরোধ, "চা খেয়ে যেতে হবে।" কিন্তু কাকাজী সময় নষ্ট করতে রাজী নয়। শিব রতন সিং চৌধুরীর করুণ চাউনিকে অসন্মান করে চলে যাওয়ার মতো ধৃষ্টতা দেখাতে পারলাম না। তাই আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। উনি আমাদের গলদঘর্ম অবস্থা দেখে চা না দিয়ে ঘোলের শরবত দিলেন। এবং কাকাজী খুব তৃপ্তি সহকারে চার গ্লাস শরবত খেলেন।

নমামি দেবী নর্মদে

দুপুর দু’টো। আর সময় নষ্ট নয়। এই সাতবাসা গ্রামটি থেকেই চলা শুরু করলাম। ঐ একই রকম রাস্তা, কখনো চাষের ক্ষেত – কখনো নদীর পাড়। সূর্যদেব ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের সহ্য ক্ষমতা পরোখ করে চলেছেন। “নর্মদে হর” মন্ত্রকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছি। যদিও সঞ্জয়ের খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কিছু বুঝতে না দিয়ে, সেও আমাদের সাথে হাঁটছে।

রাস্তায় কোন বসার জায়গা না থাকার জন্য ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়েই বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা। উঠলাম পিচ ঢালা রাস্তার উপর। এগিয়ে চলেছি রাস্তা ধরে। পাশেই একটি ছোটো চা-এর দোকান। মাঠে ছোটোরা খেলা করছে। বিশ্রামের জন্য চা-খাওয়ার অছিলায় বসে পড়লাম। গ্রামটির নাম কেশলী। দু’চার জন লোক পরিক্রমাকারী এসেছে শুনে সশ্রদ্ধ বাক্য বিনিময় করতে লাগল। ওরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিল না আজ আমরা রেবাবানখেড়ী থেকে যাত্রা শুরু করেছি। কারন এই গ্রাম থেকে রেবাবানখেড়ীর দূরত্ব ওদের হিসাব অনুযায়ী ৩৫ কিলোমিটারের বেশী। কিন্তু অশোক দাসজী মোবাইলের ম্যাপে দেখলেন আরও বেশী। যেহেতু পরিক্রমাকারীরা সত্যবাদী হয় তাই সশ্রদ্ধ চিত্তে আমাদের কথাই বিশ্বাস করে নিল, এবং সবিনয়ে জানালো এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি রাম মন্দির আছে। ওখানে থাকার এবং সদাবর্তের সু-ব্যবস্থা আছে। আমরা সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চললাম।

নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ মৎস্য শিকারী...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ জলজ উদ্ভিদজীবি...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

শিকড় (গাঁ গেরামের গপ্পো)

(১০ম পর্ব)

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

গল্প শেষ হতে না হতেই আমরা নদীর ঘাটে পৌঁছে গেলাম। দূর থেকে পাতার ফাঁকে আমাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। নদীর ঘাটে এসে দেখি আমার তিন মাসি বসে আছেন। হাঁটু সমান জল ডিঙিয়ে আমরা নদী পার হলাম। বাড়িতে এসে ব্যাগ ব্যাগেজ রেখে ফ্রেশ হলাম। বাবা-মা তখনো দিদির বাড়ি থেকে ফেরেনি। মাসি সব রান্না করে রেখেছেন। তারপর, পিঁড়ি পাতা হল। দাদু আর আমি পিঁড়িতে বসলাম। দাদু খুব তৃপ্তি করে খেলেন। তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বললেন - "জানো দীপু দা, এই খাবারের স্বাদ বাংলাদেশে আসার পর যা খেয়েছি তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।"

খাওয়ার পর কি প্ল্যান করা যায় সেটাই ভাবছি। দাদু বললেন, "নেহাত তুমি পারবে না তাই এখন ঘন্টাখানেক ঘুমিয়ে নাও, তারপর পাড়া দেখতে বেরিয়ে পড়বো।" ঘন্টাখানেক ঘুমালাম। দাদুর চোখে-মুখে তৃপ্তির ছাপ স্পষ্ট। ঘুম থেকে উঠে শুরু করলাম পাড়া বেড়াতে। প্রথমে গেলাম গ্রামের পশ্চিমদিককার জঙ্গলে।

উৎস

ঘন বন-জঙ্গলের কারণে গ্রামের মানুষ সেই জঙ্গলটিকে বলে ‘ঘোন’। এই জঙ্গলে শার্লক, ফেলুদা কিংবা ব্যোমকেশ না হোক, নিদেনপক্ষে একজন এসিপি প্রদ্যুমানের মতো ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে আমাদের শৈশব কেটেছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে ঘন বনজঙ্গল অবস্থিত। বৃক্ষ ও পোকামাকড়ে গড়া সংসার। ফলবতী সে সংসারে বৈশাখ মাসে রসালো ফলফলাদিতে ভরে ওঠে। আম পাকা পোকার গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে ওঠে এই জঙ্গল। একা একা গেলে গা শিহরে ওঠে। কিন্তু একা গেলেও নিজেকে একাকী মনে হয় না। নিজেকে সঙ্গত দেয় ভোরের দোয়েল, ঝিঁঝিঁ পোকা আর আম-কাঁঠালের সুঘ্রাণ। বৈশাখের শেষের দিকে স্কুলও বন্ধ থাকে।

আমরা ছেলেরা সদলবলে বেরিয়ে পড়ি। অস্ত্র বিনা কি আর যুদ্ধে নামা যায়! সবরকম প্রস্তুতি নিয়েই রওনা দিই জঙ্গলের দিকে। প্রস্তুতি বলতে নুন-মরিচ আর একটা ছুরি হলেই ল্যাটা চুকে গেল। তারপর, শুরু হয় অভিযান। জঙ্গলের নাড়ি-নক্ষত্র আমাদের চেনা। কোন গাছের আম কেমন; কোথায় জাম গাছ; কোন গাছের কাঁঠাল সুস্বাদু এসব তখন নখদর্পণে।

প্রথমে আমের গাছে হামলা। তারপর নধর জাম। এখানে অনেক গোলাপ জামের গাছ আছে। খেতে মন্দ নয়। খুব মিষ্টি না; কচকচ শব্দ হয়। তবে, আমাদের

মতো বাচ্চাদের কাছে এই জামটি যেন অমৃত। তারপর সোজা কাঁঠাল গাছে চোখ।

অনেক সময় এমন হত কাঁঠাল পাড়ার পর কোথাও লুকিয়ে রাখতাম। যেদিন পাকতো সেদিন সবাই মিলে এসে চলতো ভুঁড়িভোজ। এমনও হয়েছে নিজের গাছের কাঁঠাল চুরি করেছি কিংবা দলের অন্য কেউ চুরি করেছে। তবে, সবাই মিলে গোল হয়ে খাওয়ার মজা কি আর বাড়িতে পাওয়া যায়!

এখনো এই প্রজন্ম এসব অভিযানে বের হয়। তবে, এখনকার জঙ্গল আর আগেকার মতো ঘন নেই। অনেক জায়গায় জঙ্গল সাফ করে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। আগের মতো অত জামগাছও নেই। তবে অনুভূতিগুলো আমাদের মতোই আছে।

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও সে নগর...' হয়তো সেই অরণ্যকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না! তবে নগরময় আরণ্যক রচনা করা যেতে পারে। শেষ হওয়ার আগে নগর নগরের মতো গড়ে উঠুক, তবে অরণ্য ধ্বংস না হয়, এই কামনা করি। প্রকৃতির এই প্রাণের স্পন্দন কোথায় গেলে পাব! আর যাই হোক, ইট পাথরের নগরীতে তো নয়ই।

জঙ্গলে কিছুদূর ঢুকতেই চোখে পড়ে ষষ্ঠীতলা! ষষ্ঠীতলা মানে জামাইষষ্ঠী যেখানটায় হয় সেই জায়গাটা।

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, “এখনো কি আগের মতো করে জামাইষষ্ঠীর উৎসব হয়?” দাদুকে শোনালাম জামাইষষ্ঠীর পুরো ইতিবৃত্ত...

জ্যৈষ্ঠমাসের সবচেয়ে মূল আকর্ষণ জামাইষষ্ঠী। ষষ্ঠীতলা বলার কারণও আছে। এই জমিটা যাদের, তারা এখানে একটা বট ও পাইকড় (অশ্বত্থ) গাছকে বিয়ে দিয়েছে। তারপর গ্রামের সকল লোককে খাওয়াতে হয়েছে তবেই গ্রামবাসী এই স্থানকে 'ষষ্ঠীতলা' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জামাইষষ্ঠীর আগের দিনে ঘরে ঘরে নতুন জামাইসহ মেয়েরা আসে। ছেলেদের দায়িত্ব থাকে ষষ্ঠীতলা পরিষ্কার রাখা আর ফুল তুলে আনা। পরের দিন সকালে মা, মেয়ে, মাসিরা উপবাস থাকেন। গ্রামের সব মহিলারা পুরোহিতের আসার অপেক্ষায় থাকেন।

পুরোহিত আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তারপর পূজা শুরু হয়। বট ও অশ্বত্থ গাছকে কেন্দ্র করে গোল হয়ে বসেন গ্রামের মহিলারা। পূজা শেষে জামাইষষ্ঠীর ব্রতকথা পাঠ করা হয়। নতুন জামাই মিষ্টি নিয়ে আসে। প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে পূজার আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে। ...ক্রমশ ■

সিদ্ধিদাতা

পল্টু ভট্টাচার্য

আজ গণেশ পুজো। এবার শুরু হবে সব পুজোর পালা সিরিয়ালি। কখনও ভাদ্দরের ভ্যাপসানি, কখনও বৃষ্টি, তবু একটা চাপা আনন্দ সবার মনে – যদিও কেন্দ্রবিন্দু সেই আদি ও অকৃত্রিম দুর্গাপূজা। তাই সব কিছুরই আবার একবার রিহার্সাল দেবার সময় এসেছে – কি ড্রেস, কি খাওয়া দাওয়া, কি হুল্লোড়বাজি, কি প্রেম পীড়িতের খেলা...

আজ সন্ধ্যাটা কম দেখা, বেশি দেখা ইত্যাদি সবার সঙ্গে মেলার সময়। বয়স্করা আজ টিভি-কে বয়কট করেছেন, কারণ তে-মাথার মোড়ের প্যাণ্ডেলের আসরটা আজ ছাড়া যাবে না। পরে সময় করে 'খড়কুটো' বা 'কৃষ্ণকলি' দেখে নেওয়া যাবে, কিন্তু পি.এন.পি.সি.-র কোন রিপিট টেলিকাস্ট হয় না। তাই আজকে সবার গন্তব্য গণেশ পুজোর প্যাণ্ডেল। যাক্ আর কথা বাড়াব না, চলুন সবাই যাই গণেশ বাবাজীর দরবারে, থুরি প্যাণ্ডেলে।

##

আমাদের ক্লাবটার নাম 'মিলে মিশে'। আমরা সব রকম পুজো-পাব্বনেরই আয়োজন করি, কিন্তু এক একটা উৎসবে

বিভ্রাট

এক এক-জন সেক্রেটারি হয়। এই যেমন আজকের হিরো ভেল্টুদা। পুজো কি হল তার ঠিক নেই, সকাল থেকে ছ’টা পাঞ্জাবী বদল হয়ে গেল। বিলিতি সুবাস তো আছেই। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেই, মুখটা অমায়িক ভাবে এগিয়ে দিয়ে বলেন, “বলুন, আমি তো আছি আপনাদের জন্যই...” প্রচণ্ড ন্যাকামি করে মহিলা মহলে খুব জনপ্রিয় হলেও, কপাল চওড়া, তাই কেউ জোটেনি।

আজ আবার কেষ্টবিষ্টু সমাজপতিরা প্যাণ্ডেলে পায়ের ধুলো দেবেন। তাই ভেল্টুদা একটা বেশ ভাও নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একদিকে মঞ্চে গানের জলসা বসেছে। বাচ্চারা উদ্বোধনী সঙ্গীত শুরু করেছে – আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো... ওদিকে ঘণ্টারতির ধোঁয়া গোটা প্যাণ্ডেল চত্বর মাতিয়ে বেড়াচ্ছে। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত। হুটার বাজিয়ে প্যাণ্ডেলে উপস্থিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী...

— কি রে ভেল্টু আমায় বলতে ভুলে গেছিস? শোন, আজ বাদে কাল ইলেকশন, আমি গণেশ বাবাজীকে পুষ্পাঞ্জলি দেব। ব্যবস্থা করো।

ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করে, ভেল্টুদা ওনাকে একেবারে মূর্তির সামনে নিয়ে গিয়ে অঞ্জলি দেওয়ালেন। মুখ্যমন্ত্রী খুব খুশি। ভেল্টুদার হাতে, মোটা একটা টাকার খাম ধরিয়ে দিয়ে, উনি বললেন, “পরে দেখা করিস...”

মুখ্যমন্ত্রী চলে গেলে, পাড়ায় ভেল্টুদার নামের জয়-

জয়কার শুরু হয়ে গেল। ভেল্টুদার তো তখন 'আমায়-কে-পায়' 'আমায়-কে-পায়' অবস্থা... কিছুক্ষণ পরে আবার হুটার বাজিয়ে একের পর এক নির্বাচন প্রার্থীদের আগমন শুরু হল, আর চলল পুষ্পাঞ্জলির পালা। লোকে সিদ্ধিদাতা গণেশকে দেখবে – না সব গোবর-গণেশ প্রার্থীদের মুখদর্শন করবে তা ভেবে উঠতে পারে না... এইভাবেই কেটে গেছে পুরো দিনটা।

##

রাত একটা নাগাদ প্যাণ্ডেল ঘিরে শুরু হল এক বিরাট জটলা। লাঠি, বন্দুক, তলোয়ার নিয়ে বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষই হাজির। ভয়ানক চিৎকার চেঁচামেচি... সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছে – কখন কি হয়! বুড়োদের দল তো কখন কেটে পড়েছে। কারণ পান করে বাবা শিবের চ্যালারা বেদম টলছে আর খিস্তীর বন্যা বইছে।

এমন একটা ভয়ানক পরিবেশ যে হবে, তা ভেল্টুদা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। যেই না তিনি এগিয়ে ক্ষমা চাইতে গেছেন, অমনি দুই তরোয়ালধারী তাঁকে তাড়া করল। তারা গর্জে উঠল, "প্যাঁদা শালাকে..." আগে আগে ভেল্টুদা দৌড়চ্ছেন, আর তাঁর পিছনে ছুটতে ছুটতে তরোয়ালধারীরা বলছে, "এইটা ইলেকশন-এর দিন হবে। আজ রিহার্সাল-টা দিলাম।"

ওদিকে টুকরো টুকরো করে ভগ্ন গণেশ, ছেঁড়াকোরা

 পৃষ্ঠাচিত্রঃ SAurabh Narwade from Pexels

বিভ্রাট

প্যাণ্ডেল আর ভাঙাচোরা চেয়ার – ঠিক যেন জনমানব শূন্য এক রণভূমি। প্যাণ্ডেলের বাঁশ বেয়ে নেমে এলেন পুরোহিত। কাতর কণ্ঠে তিনি বললেন, "বাবা, তোমাদের সিদ্ধিদাতা বিঘ্ননাশক নন, আমাকে আর পুজো করতে ডেকো না। ওরা আমার বউকে সাদা থান পড়াবে বলেছে।"

বিমূঢ় ভেল্টুদা তখন শতচ্ছিন্ন পাঞ্জাবী গায়ে সাদা আণ্ডার প্যান্ট পড়ে শতচ্ছিন্ন প্যাণ্ডেলের নীচে থরহরি কম্প দিচ্ছে। এমন সময় আবার মুখ্যমন্ত্রী হাজির। উনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, "কিছু ভাবিস না ভেল্টু, আমি থাকতে তোকে কেউ টাচ্ করতে পারবে না। চল গানটা ধরি" – 'চল রে সবে তোরা ভারত সন্তান মাতৃভূমি করে আহ্বান...' চলমান একটা মিছিল থেকে চিৎকার আসে "গণপতি বাপ্পা মোরিয়া..." ■

 পৃষ্ঠাচিত্রঃ SAurabh Narwade from Pexels

ফিরবে না যারা

সামিমা খাতুন

পেরিয়ে যত প্রান্তর সীমানা,
যাদের ফেরার পথ অজানা,
বাঁধবে তাদের কেমন করে,
নিজের ভেবে আপন ঘরে!

না মেলে অতিরিক্ত কালি,
না কাগজ আর একফালি,
আয়ু কলমের অভিনয় শেষে,
খাতার পাতা উধাও নিমেষে।

যেতে যেতে খেলাঘরে উঁকি,
সবটাই যে মায়া আর ফাঁকি।
মনের কোণে বেদনা হয়ে,
আসা যাওয়া স্মৃতি বেয়ে।

নয়ন যাদের দেখিবারে চায়,
প্রবাসী তারা আকাশে হারায়। ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ গণপতি বাপ্পা...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জী ✧ বয়সঃ ১৪ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

ছোটবেলার বনভোজন

রিয়া মিত্র

মামাবাড়ি কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ হওয়ার দরুণ অনেক দিন পর পর সেখানে যাওয়া হত। বিশেষ করে শীতের ছুটিতেই বেশি যেতাম। ও'খানে আশেপাশের বাড়ির প্রায় সমবয়সীদের সাথে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। আমি গেলেই সকলে মিলে একটা বনভোজনের ব্যবস্থা হবেই। আসলে ওখানকার মানুষগুলোই খুব সরল, মিশুকে এবং অতিথিপরায়ণ।

শহুরে বনভোজনের তুলনায় একদমই আলাদা ছিল আমাদের সেই বনভোজন। বয়স তখন বারো। স্কুলে শীতের ছুটি পড়তেই আমরা মামাবাড়ি হাজির। আমার মামাবাড়ি কোনো এককালের পুরনো জমিদারবাড়ি হওয়ার দরুণ চারিদিকে বিশাল জমিজমা ছিল। পাশেই তিস্তা নদী, বাড়ির সামনের প্রশস্ত কুলবাগানে এক বকুল গাছের তলায় আমাদের রান্নাবান্না হবে, ঠিক হল।

সকাল থেকেই বেরিয়ে পড়লাম কাঠ কুড়াতে, কারণ ওখানে তখনও গ্যাসের প্রচলন ছিল না। কাঠে বা উনুনে, বড় জোর স্টোভে রান্না হত। তখন প্রচুর স্টোভ-ব্লাস্টের গল্প শুনে শুনে আতঙ্কে আমরা ঐ বস্তুটির থেকে দূরেই ছিলাম। মামাবাড়ির আয়ত্তের মধ্যেই বিশাল বিঘার পর বিঘা

প্রচুর গাছ ছিল। সুতরাং, কাঠ, পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে কোনো অসুবিধেই হয়নি। সেগুলো বনবাদাড়ের মধ্যে অনভ্যস্ত হাতে কুড়োতে গিয়ে অবশ্য আমার শহুরে পিঠ-হাত ছড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন কিছুই সেগুলোর অনুভব হয়নি। এরপর এসে ইট দিয়ে গেঁথে সকলে মিলে উনুন বানালাম। যদিও আমি এগুলো কিছুই করতে জানতাম না। কিন্তু ওদের দেখে আমিও ওদের সাথে হাতে হাত লাগিয়ে করেছিলাম।

মেনু ঠিক করাই ছিল। গ্রুপে সব থেকে বড় ছিল শিউলিদি। তার ওপরেই ছিল রান্নার দায়িত্ব। সুতরাং, সে যা যা রান্না করতে পারবে আর আমরা তাকে যেগুলোতে সাহায্য করতে পারব, তাই রান্না করা হবে বলে ঠিক হল। ডাল, ভাত, ঝুড়ি আলুভাজা (এটা স্পেশ্যালি ওদের অতিথি মানে আমি খেতে ভালোবাসি বলে), হাঁসের ডিমের ঝোল, এই ছিল মেনু। এরপর আমি, আমার মাসতুতো দিদি মাম্পিদি, মালতী, রিয়া, লাল্টু, টিঙ্কু, বাপনদা, ক্ষ্যাপনদা, প্রমিতদা, সোনা দিদি আর শিউলি দিদি সক্কলে মিলে বাজারে বেরোলাম। ঠিক হয়েছিল, প্রত্যেক সদস্য যে যার বাড়ি থেকে নিজের খাওয়া বাবদ এক কৌটো করে চাল আনবে (কোনো ধারণাই ছিল না যে, আমরা কেউই তখন এক কৌটো চালের ভাত খাই না) আর বাকি সব কিছু কেনা হবে। বাসনপত্র মামার বাড়ি থেকে নেওয়া হবে, খাওয়ার

থালাও কেনা হবে। যাই হোক্, বাজারে গিয়ে যখন অনেকে জানতে পারল, আমি বিশ্বাস বাড়ির নাতনি আর কলকাতা থেকে এসেছি, অনেকে ভালোবেসে, আদর করে আনাজপাতি বিনামূল্যেই দিতে চাইছিল, কিন্তু আমি নিইনি। অনেকে অনেক জিনিসের দামও কম নিয়েছিল। ওদের আন্তরিকতায় সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম।

এরপর এল রান্নার পালা। ছোটমামা ইয়া বড় জোরালো আলো লাগিয়ে দিয়েছিল বকুল গাছের গায়ে। সবার আগে ডাল, তারপর ডিমের ঝোল হল। কেউ কেউ শিউলি-দিকে হাতে হাতে সাহায্য করতে লাগল, কেউ গান চালাতে ব্যস্ত হলো, কেউ কেউ ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু করল। আমি সবগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। খুব আনন্দ হচ্ছে, এরকম পরিবেশ কখনো কলকাতা শহরে পাইনি তো।

এরপর ঝুড়ি আলুভাজা করতে গিয়ে সকলের অবস্থা খারাপ। আমার মুখে এই আলুভাজার কথা শুনে ওরা তো করতে নেমেছে ঠিকই কিন্তু কখনো ওরা এর আগে সেই জিনিস করে তো খায়নি, চোখেও অবধি দেখেনি। অগত্যা আমি কখনো-সখনো রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে মাকে যেভাবে করতে দেখেছি, সেটাই বললাম। তাতেও যেটা তৈরী হল, তা হলো, বাঁধাকপির তরকারির মতো দেখতে ঝুড়ি আলুর তরকারি। এরপর ভাত হওয়ার পর মামাবাড়ির লম্বা বারান্দায় চাদর পেতে সকলে খেতে বসলাম। আলুর ঘ্যাঁট

আর ডিমের ঝোল দিয়ে মেখে ভাত খেতে সেদিন যা আনন্দ হয়েছিল, কখনো কোনো বড় রেস্টুরেন্টের দারুণ খাবার খেয়েও আজ অবধি আমি সেই আনন্দ পাইনি।

আমরা সকলে পেট ভরে ভাত খাওয়ার পরও আরও দুই গামলা ভাত বেঁচেছিল। মায়েরা আমাদের আলুভাজা আর ভাতের পরিমাণ দেখে খুব হেসেছিল সেদিন, আমরা নিজেরাও নিজেদের কাণ্ডে হেসে অস্থির। আজ যখন পরিমাণমতো ভাত রান্না করি, তখন সেই দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে। আজ কোথায় সেই দিন, কোথায় সেই আনন্দ, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যস্ততার মাঝে কোথায় আর সেই অনাবিল আনন্দের বনভোজন!? ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

বাসে ও আবাসে

সুনৃতা রায় চৌধুরী

ছেলেবেলায় আমার একটি বন্ধু ছিল। একই ক্লাসে পড়তাম আমরা। কিন্তু আমি কয়েক মাসের বড়ো হবার সুবাদে বেশ তাচ্ছিল্যই করতাম তাকে। আমাদের দুজনের স্কুল শহরের দুই বিপরীত দিকে ছিল।

যেহেতু স্কুলবাস তখন এত ছিল না, তাই আমাদের যাতায়াত করতে হত পাবলিক বাসে। এই বাস ব্যাপারটা বেশ তাৎপর্যময় ছিল আমাদের জীবনে। ‘পকেটমার হইতে সাবধান,’ ‘৩ বৎসরের ঊর্ধ্বে পুরা ভাড়া লাগিবে,’ ‘৫ ও ১০ টাকার খুচরা পাইবেন না’ – এই সব নির্দেশিকা সমস্ত বাসেই লেখা থাকত। আবার কোথাও একটু কাব্যরসের ছোঁয়া লাগত, যেমন, '’ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়ে/ ফাঁকির টাকা যায় ডাক্তারের ঘরে’ ইত্যাদি। শিল্পসুষমারও অভাব ছিল না। লেডিস সীটের ওপরে বেশ কায়দা করে ‘এল্’ লেখা থাকত। ফণা তোলা সাপ অথবা পা ছড়িয়ে বসে থাকা মহিলার ছাঁদে। কোথাও আবার দর্শনের গভীর তত্ত্ব নজরে পড়ত। ‘বৃথাই তুমি ভাবছ বসে তুমি ভাববার কে?/ভাববার যিনি ভাবছেন তিনি, তুমি ভাব তাঁকে।’ যেহেতু বন্ধুটির স্কুল আমার স্কুলের তুলনায় দূরে ছিল, তাই তার বাসের

অভিজ্ঞতাও বেশি ছিল।

আমাদের বারান্দায় একটা কাঠের বেঞ্চ পাতা ছিল। তার পাশে ঘরের জানালার গ্রিল, তার ওপর আবার কাপড় শুকানোর জন্য নাইলন দড়ি বাঁধা উল্টো দিকের পিলারের সঙ্গে। ছুটির দিনে এই বেঞ্চটি বাস এবং বন্ধু তথা ভাইটি বাস ড্রাইভার হয়ে উঠত। আমি ছিলাম একমাত্র যাত্রী। আবার স্টপেজ এলে ড্রাইভার সাহেব নেমে এসে স্টপেজটির নাম ঘোষণা করে নিখুঁতভাবে কন্ডাক্টরের কায়দায় এক লাফে বাসে উঠে দড়িতে টান দিয়ে আবার ড্রাইভারের সীটে বসে যেত। মাঝে মাঝে টিকিট কাটতে ভুল হত না। সেই আট বছর বয়সে অন্তহীন এই বাস বাস খেলা দেখে ভাবতাম, ছেলেটা বড় হয়ে বাস কন্ডাক্টরই হবে। কোথায় কি? সেই ছেলে একগাদা ডিগ্রি-টিগ্রি জড়ো করে এখন কলেজে পড়াচ্ছে। এত সুন্দর একটি সম্ভাবনা হারিয়ে গেল।

আমার অবস্থান খুব একটা বদলায়নি। তখন বাসের যাত্রী ছিলাম, এখন আবাসের। একজন ড্রাইভার পেয়েছি বটে, তিনি যে পথে চালান, সে পথেই চলি। সেই লেখাগুলো আজও সত্য হয়ে আছে, মাল নিজ দায়িত্বে রাখিবেন (না রাখলে গেল), বা ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়ে (তা আর বলতে)? গতিহীন ভাবে চলেছি কোনো অজানা লক্ষ্যে।

ড্রাইভার বা যাত্রী একজনকে আগে চলে যেতে হবে। সবই তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছি, বৃথা ভাবার চেষ্টা মাত্র করিনা। ■

ডায়েরীর পাতা থেকে

হাজেরা বেগম (আমেরিকা)

আমি এবং আমার শিক্ষক – সত্যিই সুন্দর অণুধাবনের বিষয়। শিখতে শিখতে বেলা বয়ে গেল। শেখার তো শেষ হল না। আমি যে আজও সাগরের কূলে নুড়ি আর বালিতে... অনেক অজানাই যে অজানা রয়ে গেল। আজ যেটুকু শিখেছি, যতটুকু শিখেছি – যাঁদের কাছে শিখেছি, এই শিক্ষা দিবসে, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

আমার প্রথম শিক্ষক বাবা-মা, যাঁদের ধৈর্য্য স্নেহ আর ভালোবাসায় এক এক করে জেনেছি শিখেছি আর অবাক বিষ্ময়ে ভেবেছি আমি তো কিছুই জানি না। তাই আগ্রহ বেড়ে যেত আর প্রশ্নে প্রশ্নে কি পরিমাণ বিরক্ত করতাম বাবা-মাকে। আজও মনে হয়, আমার বাবা একটার পর একটা হাসি মুখে জবাব দিতেন। মা-ও দিতেন কিন্তু মাঝে মাঝে রেগে যেতেন আর বলতেন, “তোর মাথায় এতো প্রশ্ন আসে কোথা থেকে। একটু চুপ করে থাক।” আমি বলতাম, “মাথার ভিতর ওগুলো কামড়ায় – আমার কেমন যেন লাগে।” মা বলতেন, “বই পড়”। বাবাকে বলে দিলেন ওকে স্কুলে ভর্তি করে দাও। স্কুল হল ইংরেজী গ্রামার স্কুল। বাংলা বলে কিছু নেই। সুতরাং মায়েরও ছুটি হল না।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

বাংলায় যত কিছু আছে সব বিষয়ে মায়ের কাছে আবদার আর বাবার কাছে ইংরেজী ও সর্ব বিষয়ের আলোচনা। আজও মনে হয় সেই শিশুকাল হতে বাবা-মা যদি আমাকে এতোটা গাইডেন্স না দিতে পারতেন, তবে আমি আজকের পরিপূর্ণ আমি হতে পারতাম না।

আমার মা একজন জন্মগত শিল্পী, যিনি হাত পাখা, শীতল পাটি বানাতে পারতেন আর তার মধ্যে বইয়ের কবিতা লিখে ফেলতে পারতেন। শুধু তাই নয় বইয়ের ছবি দেখে উড়োজাহাজ পাখি, ফুল সব শীতল পাটিতে বুনেনের মাধ্যমে এঁকে ফেলতে পারতেন। সেই সময়ে কাপড়ের রুমালে ফুল পাতা লেখা ও নকশা করা উনার জন্য কিছুই নয়। খুবই সহজে সুন্দর করে সেলাই করতে পারতেন। এ ছাড়া উলের সোয়েটারেও ফুল পাখি বানিয়ে ফেলতেন। এর জন্য তিনি কোন স্কুলে যাননি। আমি অবাক উনার সব কর্ম ক্রিয়াতে নিজেও উৎসাহ বোধ করতাম।

পরবর্তীকালে একে একে রন্ধন প্রণালী থেকে শিল্পকলা, ড্রইং, মাটির তৈরী খেলনা বানানো সবকিছু শেখার মধ্যে মায়ের শিক্ষার অবদানই আছে। আমার নানা সেকালের হলেও একজন উদার সংস্কৃতিমনা মানুষ ছিলেন। বিদুষী নানীও ছিলেন বিভিন্ন শিল্পকলার শিক্ষিকা। ধন্যবাদ আমার সৃষ্টিকর্তাকে, ওনার আশীর্বাদে আমি কিছু হলেও শিখতে পেরেছি।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

আমার বাবা তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের একজন শিক্ষিত মানুষ। তিনি তাঁর মা বাবা দুইজনের উৎসাহে পড়াশুনা করেন। তবে আমার দাদীর আগ্রহ ছিল অনেক বেশী। তাঁর ইচ্ছার কারণে বাবাকে তিরিশ মাইল দূরে জায়গীরে থেকে পড়াশুনা করতে হয়েছে। দাদী চাইতেন ওনার ছেলে অনেক বড় বিদ্বান হোক। বাবা ভাল ছাত্র ছিলেন। সে সময়ে পড়াশুনায় ভাল করায় জলপানি (বৃত্তি) পেয়ে ছিলেন। পড়া শেষ করেই তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যোগদান করেন। পরবর্তী কালে পাকিস্তানের বিমান বাহিনীতে বৈমানিক ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যোগ দেন।

তিনি লেখা পড়ার সাথে সাথে খেলাধুলা পছন্দ করতেন। তাঁর উৎসাহে নিয়মিত আমিও খেলতাম। আমার বাবা অঙ্কে জবরদস্ত ছিলেন। আমার অঙ্কে স্টার মার্কস পাওয়ার পিছনে তাঁর শিখাবার কৃতিত্বই প্রধান। আমার দু'জন শিক্ষক ছিলেন তাঁরাও এ কৃতিত্বের দাবিদার।

বাবা ইতিহাসকে এতো সুন্দর করে গল্প বানিয়ে দিতেন, তাতে পড়ার আগ্রহ তো বাড়তোই সঙ্গে ক্লাসে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেতাম। এ সমস্ত কৃতিত্বে জন্য বাবাই সম্মানীত আমার কাছে।

বাটিক শিল্প শেখার সময় প্রতিষ্ঠানের দুই-তিনজন শিক্ষক ছিলেন। যাঁদের অক্লান্ত চেষ্টা আর সাহসিকতাই

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

আমাকে উৎসাহ দিয়েছে অনেক। তাছাড়াও কিছু শিল্পী শিক্ষক ছিলেন, যাঁরা সময় দিয়েছেন কিন্তু বিনিময়ে কিছুই নেননি। ওনাদের উৎসাহ অনেক বড় পাওয়া আমার জীবনে — কৃতজ্ঞতার সাথে সেই সব আজও স্মরণ করি।

শিল্পী জুনাবুল ইসলাম স্যার — যিনি চারুকলা বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বিখ্যাত শিল্পী জয়নাল আবেদীন স্যারের ভ্রাতা। জীবনে বিভিন্ন সময় স্কুল-কলেজে এবং অন্যান্য বিষয়ে অনেক অনেক শিক্ষকের কাছে অনেক কিছু শিখেছি, এখনও শিখছি। অন্তরের অন্তরস্থল হতে প্রত্যেকের প্রতি আমার বিনীত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের এ ঋণ কোনদিন ভুলব না। আমাকে ভালোবেসে সবাই যা দিয়েছেন তার মূল্য অপরিসীম, অতুলনীয়।

সবশেষে বলব, শেখার ভিত্তি যদি প্রথমেই মজবুত হয়, পরবর্তীতে শাখা-প্রশাখা মেলতে কোন অসুবিধা হয় না। শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিবার, এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।

বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই আমার সকল শিক্ষকদের প্রতি। ■

ছোটবেলার কথা

স্তুতি সরকার

জয়েন্ট ফ্যামিলি তখন ঘরে ঘরে। আমাদেরও বিরাট জয়েন্ট ফ্যামিলি। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, দাদুর এক ভাই, (অনেক অল্প বয়সে ওই ঠাকুরমা মারা গেছেন), ওনার দুই ছেলে মেয়ে, দাদুর দুই বিধবা বোন, আমার ঠাকুরমার এক ভাই (উনি বিয়ে করেননি), ঠাকুরমার মা, আমার বাপিরা ৫ ভাই, ৪ বোন। এই এত বড় সংসারে বিয়ে হয়ে আমার মামণি এলেন। ভাই-বোনেদের মধ্যে আমার বাপি বড় আর সংসারের মধ্যে একমাত্র আরনিং মেম্বার হলেন আমার বাপি। বাকী কাকু পিসিরা স্কুল কলেজে পড়ে। একমাত্র বড় পিসির বিয়ে হয়েছে তখন। অতজন গুরুজনের মধ্যে অনেক আচার বিচার সামলে সকলের মন যুগিয়ে চলা। ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে পাটের শাড়ী পরে সব গুরুজনদের প্রণাম করে রান্না ঘরে ঢোকা। ঠাকুরমাকে হাতে হাতে রান্নার জোগাড় দেওয়া আবার পাটের শাড়ী ছেড়ে অন্য শাড়ী পবে বাড়ীর বাকি কাজ সামলানো। বিয়ের পরে ন'বছর বাড়ীর ছাদে ওঠেননি আমার মামণি।

এহেন পরিবারে আমার জন্ম। বাড়িতেই জন্ম আমার। বাঁশের চ্যাঁচারি দিয়ে পিসিঠাকুরমা আমার নাড়ি কেটে

ছিলেন। বলতে পারি সোনার চামচ মুখে নিয়ে আমি জন্মেছি। কারণ এহেন বাড়িতে প্রথম মেয়ে জন্মেছে। আশ্চর্যজনক ভাবে বাড়িতে জোড়া শাঁখ বেজেছিল। পরদিন সকালেই খবর পেয়ে বড় পিসি ছুটে এসেছিলো শ্বশুরবাড়ি থেকে ভাইঝিকে দেখতে।

আমার বাবা ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে চাকরি করতেন। সিফটিং ডিউটি ছিল। নাইট ডিউটি চলছে তখন। চান খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়েছেন দুপুরে, ঠিক পাশের ঘরে মামণির আঁতুর ঘরে কাকু পিসিরা জামা কাপড় পাল্টে চলে এসেছে। সবাই ব্যস্ত ভাইঝির মুখের কোনখানটা বৌদির মতো আর কোনখানটা রাঙাদার মতো সেই সব বিচার বিশ্লেষণ করতে। এমন কি নিজেদের সঙ্গেও যখন তারা অনেক মিল পেতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই সে এক বিশাল কাণ্ড। হঠাৎ দরজার পাশ থেকে বাপি চেঁচিয়ে উঠলেন, “তোদের মুখ নাক চোখ - দেখাচ্ছি দাঁড়া!” আর যায় কোথায়! এর তার পাশ দিয়ে কে কোথায় তখন পালালো। তারপর চলল ঘণ্টা ধরে আমাকে কোলে নেওয়ার পালা। আধ ঘণ্টার এক মিনিট কেন বেশী কোলে নিলো ও! এর কোলে, তার কোলে — কোল পালটে পালটে নেবার পালা চলছে। মামণি বলেন, “তুই ঘুমোতিসও সকলের কোলে। বিছানাটা পাতাই থাকত শুধু।”

একদিন হাঁটতে শিখলাম। শিখলাম ছুটতেও। স্কুলে ভর্তি

হলাম। আমার ছোটোবেলাটা কেটেছিলো শ্যামবাজারের বাড়িতে। খুব বড় বাড়ি। কতো বড়ো? একটু বলতে চাই।

বাড়ির এক দিকে দু'টো বাড়ি। আর এক দিকে তিনটে বাড়ি। এতো বড়। বাহির মহল, সেখানে পেল্লায় বড় সেগুণ কাঠের সদর দরজা। ভিতরে রাস্তার দু'পাশে বৈঠকখানা, একটা ঘর, তারপর বাইরের উঠোন. বাঁদিকে টানা রক চলে গেছে, রকের পাশে ঠাকুর ঘর, তার পাশে বাইরের মহলের ঘর। ডানপাশে গোয়াল ঘর, তারপরে বাথরুম, চৌবাচ্চা বিশাল। তার পাশ দিয়ে গলির পথ, ভিতর মহলে যাবার জন্য। মাঝে খুব বড় একটা ঘর, তারপর ভিতরের উঠান। বাঁদিকে ভিতরের বড় রক চলে গেছে, রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর, ভিতর মহলের ঘরগুলোর দিকে।

এর মধ্যে ভিতরের সব শেষ ঘরটা ছিল আমার বাপি আর মামণির ঘর। তার পিছনে ছিল রাস্তায় বেরুবার জন্য খিরকীর দরজা। সেটা তালাবন্ধ থাকত। শুধু জমাদার আসলে খোলা হত। ভিতরেও বাথরুম, চৌবাচ্চা, গঙ্গা জলের চৌবাচ্চা, পিছল ধরা উঠান, কয়লার ঘর, ঘুঁটের ঘর, ছাদের সিঁড়ি, ছাদ। প্রচুর গাছপালা বাড়িতে। আর রিত অনেক চড়াই পাখি। গঙ্গা জলের চৌবাচ্চায় মাঝে মাঝে চিংড়ি মাছ জন্মাত। বাড়িতে রোজ সকাল সকাল বাজার আসত। নিরামিষ বাজার, আর আঁশের থলিতে বড় মাছ। মাছের মুড়ো দিয়ে ডাল রান্না হত। বাড়িতে রোজ পান,

দোকতা, জরদা প্রভৃতি আসত দাদু ঠাকুরমাদের জন্য। ঘরে পান সাজা হত। চুন খয়ের ভেজানো থাকত। ভোর রাতে কখন খবরের কাগজ দিয়ে যেত জানা যেত না। রতন গোয়ালা ভোরে দুধ দিয়ে যেত।

এতো মানুষের মধ্যে ছোট্ট আমি বড় হচ্ছিলাম। বাচ্চা আমি দৌড় লাগাতাম সবচেয়ে ভিতরের ঘর থেকে একদম সদর দোর পর্যন্ত। এর চার বছর পরে আমার বোন জন্মাল। তারও অনেক পরে ভাই। আমার মামণি ছিলেন চিন্ময় লাহিড়ী আর জগন্ময় মিত্রের ছাত্রী। খুব ভালো গান করতেন। পিসি কাকারা একেকজন একেকরকম শিখছেন। বাপি জন গেমেশের কাছে সেতার শিখেছিলেন। ন-কাকা তবলা, ছোটোকাকা টেনারব্যনজ, বাবু কাকা বাঁশী, এমন সব। সকলেই আবৃত্তি করত। পলামা ছোটোবেলায় লাঠি খেলা শিখত। আমার মামণির কাছে আমাদের গান শেখার হাতেখড়ি। বাপির কাছে টুকটাক সেতার শিক্ষা।

তখন বাচ্চাদের গল্পর বই, শারদীয়া সংখ্যা ছোটোদের জন্য, বড়োদেরও শারদীয় সংখ্যা, জলসা ইত্যাদি আসত। কারণ বাড়িতে ছিল বিভিন্ন বয়সের পাঠক-পাঠিকা। সকলেই খেলাধুলা করত। পাশেই ছিল দেশবন্ধু পার্ক। শৈলেন মান্না, চুণী গোস্বামীদের টীমে ফার্স্ট ডিভিসানে খেলতেন কাকুরা।

আমি ও ছোট থেকেই এথলিট হিসাবে ট্রেনিং নিতাম বাবু কাকুর কাছে। এবং বিভিন্ন মিটে পারফর্ম করে ফার্স্ট

প্রাইজ পেতাম। আমি জীবনে কোনোদিন ফার্স্ট ছাড়া সেকেণ্ড প্রাইজ পাইনি। এমনকি এই বুড়ো বয়সে সেদিন দিদি নং ওয়ানে (২৮/৮/২০১৮) ফার্স্ট প্রাইজটা নিয়ে এসেছি জি-বাংলা থেকে। আমাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে তখন ইলেকট্রিক লাইট ছিল না।

আমরা বড় হবার পরে মামণি জোর করে লাইট আনিয়ে ছিলেন বাড়িতে। সকালে রান্না-বান্নার পর রুটির ডাঁই তৈরী করতেন মামণি আর ঠাকুরমা। দুই বিধবা পিসির নিরামিষ রান্নাঘরে রান্না হত। সেটাও মামণিই রান্না করতেন। তাদের খাওয়ার জায়গা ও আলাদা আলাদা ছিল।

আমাদের শ্যামবাজারের বাড়িটা প্রায় ১২৫ বছরের বেশি পুরানো তখন। ওই বাড়িতে আমাদের কতো স্মৃতি জড়িত আছে। আমার জন্ম ওখানে। খুব উঁচু কড়ি বরোগার প্রায় ন্যাড়াছাদযুক্ত একতলা বাড়ি। চুন সুরকির ঢালাই। গরম কালে খুব ঠাণ্ডা থাকত ভিতরটা। প্রতি বছর সারা বাড়ি চুনকাম হতো তখনকার দিনে। প্রতিদিন পার্কে বেড়াতে যেতাম আমরা পিসিঠাকুরমার সঙ্গে। পাড়ার কতো বন্ধু! বিরাট দল একটা। বুড়িদের কেউ কেউ আসন বোনা নিয়ে বসে পড়ত। কেউ উল বুনতেই ব্যস্ত। একদল আবার তাস খেলতেন। কেউ বসে থাকতেন। আমরা খেলতাম। চোরচোর, লুকোচুরি, ছুটোছুটি চলতেই থাকত। পার্কে তখন এন.সি.সি. বা স্কাউট গাইড শুরু হল। অপাদি আর

অজিতদা এসে ব্যাণ্ড বাজানো শেখাতেন। আর কত রকম খেলা ছিল যে, খো খো, গাদি, বাস্কেটবল, থ্রোবল, আরোও কতো কী। লেডিস পার্কে আমরা খেলতে যেতাম। মামণি বাদাম খাবার জন্য চার পয়সা করে দিত। অনেক বাদাম হত তাতে।

মনে পড়ে এক বর্ষার দিনে ভিজে ভিজে মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পযর্ন্ত ছুটে ছুটে টিয়াপাখি ধরতে যাওয়া। ঢেঁকি, স্লিপ, দোলনা বসবার বেঞ্চ সবই আছে পার্কের একদিকে। পার্কের ভিতরের চারিধারে পীচ বাঁধানো রাস্তা। সন্ধ্যার অন্ধকারের আগেই বাড়ি ফিরে আসা... লিখতে বসে, অনেক কথা মনে পড়ছে আজ। বোধহয় তখন চীন-ভারত যুদ্ধ। আমাদের বাড়িতে অনেক লোক এসে উপস্থিত। তালতলার বাড়ির পিসিমারা ছেলেপুলে নিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ থেকে তাঁদের সম্পর্কের ননদ, দেওর, ছেলেপুলেরাও এসেছেন, আশ্চর্যজনক ভাবে মামণি হাসিমুখে সব সামাল দিচ্ছেন। টাইমে টাইমে খাওয়া দাওয়ার যোগাড় দেওয়া, শোওয়ার ব্যবস্থা করা। এতো শান্ত এতো কাজ — কি করে যে পারতেন মামণি। দশভূজা।

সেই সময় একদিন খেলতে খেলতে বাইরের মহলের একটা ঘরে আমার তিন বছরের বোন জানালার গরাদের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। দেহ একদিকে, মাথা গরাদের অন্যদিকে। ধুন্ধুমার কাণ্ড।

ছুটোছুটি, অবশেষে কাকারা গরাদ বেঁকিয়ে ওকে বার করে আনল। কিন্তু তার আগে দামাল সব বাচ্চারা বোনের মুণ্ডু বেঁকিয়ে গরাদ থেকে বার করবার চেষ্টার ক্রুটি রাখল না। বেচারা বনু। ভাগ্যিস ছোট্ট ছিল।

তখনকার পুজো বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানেতে আমরা পার্বণী পেতাম। গুরুজনেরা আমাদের টাকা পয়সা দিতো যার যা ইচ্ছে। মামণির কিন্তু পছন্দ নয় আমরা হাতে টাকা পয়সা পাই। ঠিক ভুলিয়ে ভালিয়ে মামণি টাকা পয়সা নিয়ে নিত। তখন বাড়ির সামনে নিলামবালা সাড়েছআনা আসত। যা নেবে তাই ছ'আনা এক দাম। কি সুন্দর প্লাস্টিকের পুতুল, ছয় ইঞ্চি লম্বা গোল একটা পিজবোর্ডের এক দিকটা বন্ধ আর অন্য একদিকে রঙীন কাগজ আঁটা। তার মধ্যে একটা চোখ রেখে অন্য চোখ বন্ধ করে ভিতর দিকে দেখা। বিস্মিত হয়ে দেখতাম ওটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভিতরের পার্টিসানের মধ্যে কাঁচের মতো কতো কি ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। আর একটা জিনিস আসত টিনএর চৌকো বাক্সের চারসাইডের মাঝখান করে ঢাকা সমেত গোল বাক্স। চারদিক থেকে ছোটোরা ঢাকনা খুলে চোখ রেখে ভিতরে দেখতে পেত সিনেমা।

তখন নিয়ম করে রাস্তা ধোয়া হত গঙ্গার জল পাইপ দিয়ে। কালের নিয়মে পলি পড়ে পুরো জলের পাইপ বুঝে যায়। তখন রাস্তার ধারে জ্বলতো গ্যাসের আলো। সন্ধ্যার

সময় একটা লোক এসে বাতি স্ট্যান্ডের ওপরে সুইচ টিপে গ্যাসের আলো জ্বেলে দিত। আমাদের বাড়ির গায়েই ছিল একটা স্ট্যাণ্ডে লাগানো গ্যাসবাতি। বাড়ির প্রথম বাঁদিকের ঘরটা ছিল ছোটোমামার (ঠাকুরমার ভাই) ঘর। রাস্তার দিকের জানালার বাইরে রাস্তার ওপর ছিল বসার রক।

তখনকার সব বাড়ির বাইরে বাড়ির লাগোয়া একটা করে এরকম রক থাকত। সেখানে পাড়ার বুড়োরা সন্ধ্যায় মজলিশ বসাত। সারা দিনে দফায় দফায় চলত পাড়ার বড়ো ছেলেদের আড্ডা। মা-বৌরা বিয়ে বা কাজের বাড়ি ছাড়া পাড়া বেড়াত না। মেয়েরা এর তার বাড়ি যাতায়াত করত। ছোটো মেয়েদের ছাড় ছিল শুধু বিকেলে খেলতে যাওয়ার। আর ছোট ছেলেরা রাত দিন ঘুরে বেড়াত টো টো করে। বাড়ির লোকেরা কিছু বলতে হয়, তাই জানতেন না। এই ছিল তখনকার পাড়া কালচার।

আমার ঠাকুরমা খুব গঙ্গা নাইতে যেতেন সকালে। শ্যামবাজারের বাড়ি থেকে বাগবাজার ঘাট পর্যন্ত রিক্সায়। ছুটি থাকলে আমরা দুই বোনও সঙ্গে যেতাম। কি বিশাল গঙ্গা। রিক্সা থেকে নেমে কিছুটা ইঁট বাঁধানো রাস্তার ওপর পলি মাটির আস্তারণ জমে পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে। শেষে সবটাই পলিমাটির আস্তরণ গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত। সরু রাস্তার দুপাশে মণিহারি দোকান। পুজোর ফুল, আরোও কত কি! প্রচুর ভিখিরী ভিক্ষা চাইছে। কেউ চান করতে নামছে জলে

শুকোনা জামা কাপড়ের ব্যাগ ছাড়া চটির ওপর রেখে। কেউ চান করে উঠে আসছে। একধারে পূজো বা পিণ্ডদানও চলছে। খাবারের দোকানীরা বসেছে পসরা সাজিয়ে। মামণি আমাদের হাতে কিছু পয়সা দিয়ে দিতেন, ইচ্ছে মতো কিছু কেনবার জন্য একনয়া পয়সা, দু'নয়া পয়সা, ছয় কোণা তিন নয়া পয়সা, পাঁচ নয়া পয়সা প্রভৃতির গুণিতকে। ঠাকুরমা দুই বোনকে কিনে দিতেন হাত ভর্তি চুড়ি, প্লাস্টিক-এর খেলনা, মাটির ফল, মাটির সন্দেশ। কোনো না কোনো কাকা সাইকেলে আমাদের সঙ্গে যেতেন। তারপর জিনিসপত্র কিনে, রিক্সা করে আবার বাড়ি ফেরা। তারপর ধীরে ধীরে কঠিন বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে এসে ছোটোবেলার নটেগাছটি মুড়িয়ে গেল। নিজের অজান্তেই কখন যেন বড় হয়ে উঠলাম। ■
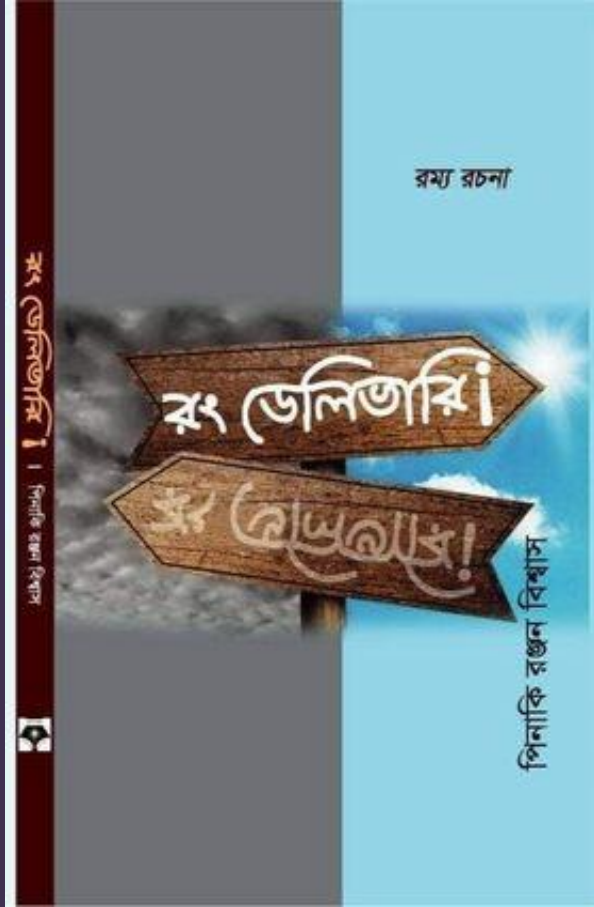
দুকুরবেলা

অমিত নাগ (আমেরিকা)

নারকেল গাছের পাতাগুলো দমকা হাওয়ায় ঝিরঝির আওয়াজ তুলে শেষ সকালের শুনশান নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। সকাল শেষ, দুপুর শুরুর মুখে। বাবা অফিস চলে গেছে ভাত খেয়ে মৌরি চিবোতে চিবোতে স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে অফিসের ব্যাগ হাতে। আজ স্কুলে যাইনি। ভোর রাত থেকে জ্বর জ্বর ভাব, চোখে জ্বালা জ্বালা অনুভূতি, মুখে তিতকুটে স্বাদ।

তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে স্প্রিঙে টাঙানো টান টান পর্দা সরিয়ে জানলা দিয়ে নারকোল, দেবদারু, পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখছি ক্লান্তিহীন ভাবে। প্রতিবেশীদের পাঁচিলের পাশ দিয়ে নর্দমা চলে গেছে পুকুরের দিকে। নর্দমার পাশে কচু গাছের পাতাগুলো আচমকা ঘূর্ণি হাওয়ায় পাগলের মতো মাথা নেড়ে দোল খেয়ে ওঠে। পিচের রাস্তায় ধুলোরা কুন্ডলি পাকিয়ে মিনি টুইস্টারের মতো পাক খেয়ে মাটি ছেড়ে ওপরে উঠে যায়। জানলা দিয়ে একটা গরম ভাপ আর ধুলোর গন্ধ বিছানায় ধেয়ে আসে। কাঁসার থালা বাসন বিক্রির মালিক চলেছিল আগে আগে। একটা কাঁসরের মতো পাত্র ছোট একটা ডান্ডা দিয়ে বাজাতে

বাজাতে। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। বাসন বোঝাই বস্তা মাথায় বিহারী কর্মচারীটি, ঠিক তার পেছনে পেছনে। ধুলোর থেকে বাঁচতে, মোটাসোটা ব্যাপারী লোকটি লাফিয়ে রাস্তার ধারে সরে যায়। আমার হাসি পায়।

বিছানার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা গল্পের বইগুলো - শুকতারা, কিশোর ভারতী, শারদীয়া বলাকা, আগমনী, দ্য এডভেঞ্চার অফ টম সোয়ার, আরাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেস এর বাংলা অনুবাদ। আজ আর পড়াশুনোর জন্য কেউ চাপ দেবে না। আমার অসুখ করেছে। আজ তাই এই সব বই পড়বো সারাদিন ধরে, শুয়ে বসে। আর জানলা দিয়ে রাস্তা দেখবো।

মোড়ের কারখানার ঘটাং ঘটাং শব্দটা থেমে গেলো। এখন ওদের টিফিন টাইম। কারখানার লোকগুলো চায়ের দোকানে টিফিন করবে এবার। আলুরদম পাঁউরুটি অথবা ঘুঘনি পাঁউরুটি। তারপর কেটলির নল উচুঁ করে মুখের ওপরে ধরে ঢক ঢক করে জল খেয়ে, হাত দিয়ে মুখে চোখে জল ছিটিয়ে তবে শান্তি। যা গরম পড়েছে... ওদের মালিক খাবে ডিম পাঁউরুটি আর এক গ্লাস চা।

রাস্তার মোড়ে, টিউবওয়েলের হাতল ধরে হাফ প্যান্ট পরা ছেলেটা ঝুলে পড়ছে, ওর বোন কলের নলের মুখটায় মুখ নিয়ে গিয়ে জল খাবার চেষ্টা করছে। যত না খাচ্ছে, তার থেকে বেশি ফেলে ছড়িয়ে হি হি করে হেসে গড়িয়ে

পড়ছে। গরমে পিচের রাস্তা থেকে পাতলা বায়ুস্তর নড়তে নড়তে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সেই গরম হাওয়ার পাতলা স্তরের পেছনে টিউবওয়েল, বাচ্চা ছেলে আর মেয়েটার ছবি কেঁপে কেঁপে উঠছে, অয়েল পেইন্টিং-এর ধূসর অস্পষ্ট ছবির মতো।

ধুনুরি চলে গেলো ট্যাঙ্গস ট্যাঙ্গস আওয়াজ করতে করতে। ধুনুরি কোনো কথা বলে না। এই গরমে কে আর লেপ বানাবে। বোধহয় তোষক ফোসকের ব্যাবসার সময় এটা! মুচির ডাকে কোনো অর্থপূর্ণ শব্দ নেই। একটা "ইয়োপ" গোছের আওয়াজ। ওতেই বেশ বোঝা যায়, চটি জুতো সারানোওয়ালা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। তবে গরমের দুপুরে বাতাসে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া "শিশি বোতল পুরোনো খাতা বই বিক্রি কাগোস...স... স..." আওয়াজে মনটা যেন কি একটা অজানা জিনিস হারানোর দুঃখে হা হুতাশ করে ওঠে। ঠিক কি হারানোর যে ব্যাথা তা চিনতে না পারলেও, কিছু একটা হারানোর অনুভূতি মনের গভীরে রিনরিন করে ওঠে।

ওই পথ দিয়ে বাবা বেরোনোর পরে পরেই জ্যাঠা ফিরে গেছে স্টেশনের পথে। দেশের বাড়ি থেকে এসেছিলো মধ্যবয়সী অকৃতদার জ্যাঠা। বছরে দু'তিন বার আসে। আসার সময় নিয়ে আসে দেশের গাওয়া ঘি আর ঘিয়ে ভাজা পান্তুয়া। অমন ঘিয়ের গন্ধে ম ম সুগন্ধি পান্তুয়া আর

কোথাও খেতে পেলাম না কোনোদিন – বড় হয়ে এত হিল্লি দিল্লি ঘুরেও।

মাড়োয়াড়িদের দোকানেও নয়, থিয়েটার রোডের ছপ্পন ভোগেও নয়। জ্যাঠা আসে আমাদের কাছে, তিন চার দিন হৈ হৈ করে। নিজের ছেলেপুলে নেই, সংসার নেই, কেউ নেই আমরা ছাড়া। সন্ধ্যে বেলায় বাজারের পাশের দোকান থেকে জিলিপি চপ ক্ষীরের সিঙ্গাড়া কিনে খাওয়ায়। নিজের শখ বলতে কলেজ স্ট্রিট এর বাজার থেকে কোলাপুরি চটি, ধুতি আর গোপালের গেঞ্জি কেনা। যাবার সময় চার আনা বা আট আনা পয়সা দিয়ে যায়। সে পয়সা অনেক পয়সা। এক গাদা সেলোফেন কাগজে মোড়া চাটনি, হজমি গুলি, মৌরি, টিকটিকি বা লেবু লজেন্স হয়ে যায় ওতে। বালিশের তলা থেকে জ্যাঠার দিয়ে যাওয়া আধুলিটা বার করে হাত বুলোতে বুলোতে রাস্তা যেখানে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সে দিকে চেয়ে থাকি। ওই পথে চলে গিয়েছে জ্যাঠা কয়েক ঘন্টা আগেই।

পুরানো কাগজ শিশি বোতল কেনার ফেরিওয়ালা চলে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। এখন বেশ অনেকটা সময় থাকবে এমনি নিঃশব্দ ঝিমধরা শুনশান। রোদ্দুর পড়লে, সেই বিকেলবেলা আবার শুরু হবে আইসক্রিমওয়ালা, সোনপাপড়িয়ালাদের হাঁকডাক। যখন পড়ি, "ঠিক দুককুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা," সেই দুপুর যে এই দুপুর

বুঝতে অসুবিধা হয় না। সকালেই অফিসের রান্না বান্না ঘরের কাজ সব হয়ে গিয়েছে। মা তাই টুকটাক ঝাড়পোছ পরিস্কারে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এখন উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। উঠোনের মেঝে ফুঁড়ে উঠে গেছে এক মাথা উঁচু নারকোল গাছ। গাছ থেকে ফুল পড়ে উঠোন ভরিয়ে দেয়। মা সে সব পরিষ্কার করে। ফুল আর ডাবের অপরিপূর্ণ মুচি শুধু যে পড়ে তাও নয়। মাঝে মাঝে নারকোল পড়ে দুম দাম। নারকোল পড়ায় কখনো সখনো গৃহস্থের তোলা উনুন ভেঙে যায়। উঠোনে রাখা থালা বাসন দুমড়ে যায়। মা রাগে গজ গজ করে। তবু নারকোল পড়া যেন অপ্রত্যাশিত মূল্যবান সম্পত্তি প্রাপ্তি। দারুন আনন্দের ব্যাপার।

এই দুপুরে এবার আসবে চালউলি বুড়ি। চালের বস্তা বইতে বইতে কুঁজো হয়ে গেছে। ছেলে দেখে না, নাতি হুজ্জুতি করে টাকা পয়সা দেবার জন্য। তাই এই বয়সেও চাল বিক্রি করতে বেরোতে হয় – ট্রেনে চড়ে গ্রাম থেকে এই শহরতলির রাস্তায়। রোজ রোজ চাল কেনার প্রয়োজন পড়ে না কারো। বাড়ি থেকে তাই আরো নিয়ে আসে ঘরের হাঁসের ডিম। কখনো বা আসার পথে পুকুর পাড় থেকে কুড়িয়ে পাওয়া পাকা তাল। দু’ চার পয়সা যা পাওয়া যায় এ সব বেচে। সবার বাড়ি ঘুরে ফিরে যাবার আগে আসে আমাদের বাড়ি। তাল কেউ কেনে নি। তালের বড়া বানানো খুব ঝামেলার কাজ। ঝুড়ির গায়ে ঘষে ঘষে তাল থেকে

ক্বাথ বার করতে হয়। মোটেই সোজা কাজ নয়। আমাদের বাড়িতেও তালের বড়া হয় বছরে বড়োজোর এক দিন বা দু দিন। মায়ের তাল কেনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বুড়ি জানে, কেউ কিনুক না কিনুক মা শেষ অবধি কিনবেই। তাই ঘরে ফেরার সময় আমাদের বাড়ি ছুঁয়ে যায় প্রায়ই রোজ।

তেমনি আসে পুরোনো শাড়ির বদলে স্টিল এর থালা বাসন বিক্রি করতে অবাঙালি বধূটি। এই দুপুরে কর্তারা বাড়িতে থাকে না। এরা সে খবর রাখে, আর এও জানে, যে কর্তাদের থেকে গিন্নিদের মন অনেক নরম অনেক উদার। এ সব আমার জানার কথা নয়। মাঝে মধ্যে জ্বরজ্বারি হলে দুপর বেলা ঘরে থাকি বলেই জানি এ সব।

এবার বিছানাতেই বালিশের ওপর প্লাষ্টিক চাদর বা রবার ক্লথ রেখে, তার ওপর মাথা হেলিয়ে দিয়ে বালতি থেকে জল ঢেলে মাথা ধুইয়ে দেবে মা। তারপর হালকা গরম জলে গা স্পঞ্জ। মাথায় ঢালা জলের দু এক ফোঁটা অসাবধানতাবশত কপাল ছুঁয়ে মুখমণ্ডলে গড়িয়ে পড়ে। চোখ বুঁজে থাকলেও সেই জলের ফোঁটা বন্ধ চোখের পাতার ওপর দিয়ে নাকের পাশ দিয়ে ঠোঁটের ওপর গড়িয়ে আসা অনুভব করতে পারি স্পষ্ট। জিভ দিয়ে টেনে নিই সেই জলের বিন্দু মুখের গভীরে। গা ধোয়া মোছা হলে, আলু বেগুন কাঁচকলা আর মাছের শুধু জিরে হলুদ দিয়ে রাঁধা পাতলা ঝোল আর নরম করে গলা গলা ভাত খেতে দেবে মা।

নস্টালজিয়া

ভাত খেয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোতে নেই, জ্বর আসে তা হলে। এখন কিছুক্ষণ জেগে বসে থাকার কথা। মায়ের সাবধানবাণী, আপত্তি... মানার চেষ্টা করেও সামলাতে পারিনা। গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমে শরীর ঢুলে আসে। আসন্ন জ্বরে শরীর কেঁপে ওঠে। চাদর মুড়ি দিয়ে কাঁপতে থাকি।

একটা জীবন কেমন যেন জ্বরের তরাসে, ঘোরের মধ্যেই কেটে গেলো, বাস্তব জীবনটা ঠিক মতো বুঝে ওঠার আগেই। একা একা ঘোরে মগ্ন একটা জীবন। এখন আর এই ঘোর তরাসময় জীবনের তপ্ত কপালে জলপট্টি দেবার মতো কেউ নেই পাশে। আমি তবু ঘোলাটে চোখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি, সময় বয়ে যায়। তাকিয়েই থাকি। দারুন একটা কিছু যদি ঘটে এই আশায়। দুম করে নারকোলও যদি পড়ে আবার আগের মতো দু’ একটা... ■

‘গুঞ্জন’এর ২০২১ এর আগামী
সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

অক্টোবর – পূজা সংখ্যা

নভেম্বর – দীপাবলি সংখ্যা

ডিসেম্বর – অণু সংখ্যা

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ বাংলার বাউল...

শিল্পীঃ রূপসা পাল ✧ বয়সঃ ১৬ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

অদ্ভুত কিছু গল্প

দোলা ভট্টাচার্য

আমাদের বাড়ির সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই অনেক গল্প শুনে আসছি। এগুলো ঠিক গল্প না গুল্প তা কে জানে। আসলে আমার বাবা, জেঠুরা মুখে মুখে অনেক গল্প বানাতে পারতেন। গল্পগুলো সত্যি মিথ্যায় মিশিয়ে এক একটা অপরূপ আখ্যানে পরিণত করতেন তাঁরা। আর সেগুলো আমরা খুব মনোযোগ সহকারে শুনতাম। আজ সেইসব মানুষগুলো আর নেই। তবে আমার রাতের স্বপ্নের ভিতরে তাঁদের আসা যাওয়া টের পাই আজও। যে গল্পগুলো ফেলে গেছেন তাঁরা, সেগুলো চিরতরে হারিয়ে যাবার আগে লিপিবদ্ধ করে রাখলাম আমার খাতার পাতায়।

সেটা ছিল পৌষ মাসের হাড়কাঁপানো একটা শীতের সন্ধ্যা। বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে। জমিয়ে গল্পের বই পড়ছি। আচমকা লোডশেডিং হয়ে গেল। যাঃ! কি করব! তখনকার দিনে ঘরে ঘরে এমন ইনভার্টার ছিল না। মোমবাতি আর হ্যারিকেনই ভরসা। মা একটা হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেল। ওই স্বল্প আলোতে বই পড়া মুশকিল। তাই বাবাকে ধরে বসলাম, ‘গল্প বলতে হবে’।

অদ্ভুতুড়ে

গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বাবা বলতে শুরু করলেন, আমার ঠাকুরদার ছিল ভ্রমণের শখ। ভারতবর্ষের বহু জায়গায় তিনি ঘুরেছেন, পায়ে হেঁটে। একবার উত্তর ভারত ভ্রমণে গিয়ে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। কোনো একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে তখন যাচ্ছিলেন ঠাকুরদা। হঠাৎ শুনতে পেলেন কেউ যেন তাঁর নাম ধরে ডাকছে, "কুঞ্জ, কুঞ্জবিহারী, এসো, এদিকে এসো, আমার কাছে এসো।" ঠাকুরদা তো অবাক। এই বিজন দেশে কে ওঁর নাম ধরে ডাকছে! ঠাকুরদা খুঁজতে শুরু করলেন। খুঁজতে খুঁজতে ওই পাহাড়েরই একটা গুহার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বুঝতে পারলেন, এই গুহার ভেতর থেকেই আসছে আওয়াজটা। থমকে দাঁড়ালেন ঠাকুরদা। ভেতরে ঢুকবেন কি ঢুকবেন না ভাবছিলেন। এবারে সেই কণ্ঠ বলে উঠল, "এসো কুঞ্জ, ভেতরে এসো। আমি অনেক বছর ধরে অপেক্ষা করছি তোমার জন্য।"

গুহার ভেতরটা আবছা অন্ধকার মতো। চোখটা একটু সয়ে এলে ঠাকুরদা দেখতে পেলেন এক যোগী পুরুষকে। সৌম্যদর্শন। হরিণের চামড়ার আসনে বসে রয়েছেন। দৃষ্টি ওঁরই দিকে নিবদ্ধ। যোগীপুরুষ ঠাকুরদাকে বললেন, "তোমার এখানে আসাটা পূর্ব নির্ধারিত। আমার ইচ্ছাতেই তুমি এখানে এসেছো। তোমাকে এখন অনেক কাজ করতে হবে। তার আগে আমি দীক্ষা দান করব তোমায়।"

ইনিই হলেন ঠাকুরদার দীক্ষা গুরু। বারো বছর ধরে ওঁর কাছে সম্মোহন শিক্ষা লাভ করেন ঠাকুরদা। তারপর ফিরে আসেন ভাটপাড়ায়। (কার কথা মনে পড়ছে পাঠক? যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর কথা! হ্যাঁ। খটকা একটা আমারও আছে বটে। কিন্তু যখন শুনেছিলাম এসব গল্প, তখন তো শ্যামাচরণ লাহিড়ী সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।)

ঠাকুরদা ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। সম্মোহনের মাধ্যমে বহুজনের বহু দূরারোগ্য ব্যাধি সারিয়েছিলেন তিনি। ওঁনার লেখা দুটি বইও ছিল। বই দুটির নাম যথাক্রমে ‘সরল মেসমেরিজম শিক্ষা,’ আর ‘বিসূচিকা চিকিৎসা।’ বই দুটি এখন বিলুপ্ত।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো গল্প শুনছিলাম। এবার জিজ্ঞেস করলাম, “বই দুটোর একটা কপিও নেই?”

বাবা বললেন, নাঃ। নেই। সে কি আজকের কথা! ভারত তখনও ভাগ হয়নি। কত কদর ছিল তখন ওই বই দুটোর। তারপর শোন — একবার ঢাকার নবাব খবর পাঠালেন, তাঁর একমাত্র কন্যা গুরুতর অসুস্থ। ইংরেজ ডাক্তারের চিকিৎসা ব্যর্থ হয়েছে। ঠাকুরদাকে সেখানে যেতে হবে, নবাব কন্যার চিকিৎসার জন্যে। ঠাকুরদাকে নিয়ে যাবার জন্যে দ্রুতগামী ছিপ পাঠালেন নবাব। নবাবের ছিপ নৌকা ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ঘোড়ায় চেপে রওনা দিলেন ঠাকুরদা। ছিপ নৌকা পৌঁছানোর অনেক আগেই

নবাব কন্যার চিকিৎসা করে, তাকে সুস্থ করে ফিরে এসেছিলেন ঠাকুরদা। নবাব ঠাকুরদাকে একটা বহুমূল্য পশমিনা শাল উপহার দিয়েছিলেন।

অদ্ভুত ব্যাপার! ঠাকুরদা গেলেন, চিকিৎসা করে ফিরেও এলেন, আবার উপহারও পেলেন। তারপর ঢাকায় পৌঁছোলো ছিপ নৌকার দল! ঠাকুরদা যদিও ঘোড়ায় গিয়েছিলেন। তবুও একদিনের মধ্যে ঢাকায় পৌঁছে চিকিৎসা করে ফিরে আসা! ব্যাপারটা একটু কিরকম যেন হজম হল না। ভাটপাড়া থেকে ঢাকার দূরত্ব কত? পাঠক! কি মনে হয়? যাই হোক, জিজ্ঞেস করলাম, “সে শাল এখন কোথায়?”

বাবা বললেন, ধুর বোকা! সে কি আর এখন থাকে! আমি নিজেই তো সেই শাল কখনো চোখেই দেখিনি।

সম্মোহন বিদ্যায় ঠাকুরদার মতোই পারদর্শী ছিলেন বিনোদবিহারী, ঠাকুরদার ভাই, আমাদের ছোড়দাদু। ঠাকুরদা নিজে তাঁকে শিখিয়েছিলেন এই বিদ্যা। বিনোদবিহারী আবার অন্যভাবে কাজে লাগাতেন এই বিদ্যাকে। এর মাধ্যমে তিনি জনমনরঞ্জনের কাজ করতেন। জিজ্ঞেস করলাম, “তোমার ছোড়দাদু কি ম্যাজিক দেখাতেন?”

বাবা বললেন, ঠিক বলেছিস। ওই ম্যাজিক দেখার লোভে কত লোক আসত। আমাদের এই বাড়িটাই ছিল ছোড়দাদুর বাড়ি। ঠিক এই ঘরটাতেই বসত ম্যাজিকের আসর। ঘরের মাঝখানে একটা মাঝারি মাপের চৌকিতে বসে গড়গড়া

টানতেন ছোড়দাদু। আর চৌকির চারপাশ ঘিরে বসত বাকি সকলে, মানে ছোড়দাদুর সাঙ্গপাঙ্গরা। রোজ সন্ধ্যায় ভিড় জমাত তারা ম্যাজিক দেখার লোভে। আর ভারী অদ্ভুত ছিল সেইসব ম্যাজিক। যেমন, ঘোর শীতের সন্ধ্যায়, কেউ হয়তো পাকা কাঁঠাল খেতে চাইল। কিংবা ভরা বর্ষায় কেউ হয়তো বলে বসল, "ছোড়দাদু, বড় লাউ চিংড়ি খেতে ইচ্ছে করছে।" ছোড়দাদু কেবলমাত্র শূন্যে একবার হাতটা ঘুরিয়ে কোথা থেকে একটা লাউ বা কাঁঠাল পেড়ে এনে তাদের হাতে দিয়ে বলতেন, "যা! বাড়ি গিয়ে খা গে!" লাউ প্রেমী এবং কাঁঠাল প্রেমী দুজনেই খুশি। তারা তো তক্ষুণি বাড়ির রাস্তা ধরল। কিন্তু ঘর থেকে উঠোনে নামতেই লাউ-কাঁঠাল দুটোই হাওয়া।

একদিন সবাই ধরে বসল, "ছোড়দাদু, ওসব ম্যাজিকের লাউ কাঁঠাল অনেক খাইয়েছো। এবার নতুন কিছু দেখাও।" তখন সবে সন্ধ্যা নেমেছে। ঘরে তখনও আলো জ্বালানো হয়নি। ছোড়দাদু বললেন, "এইরে। আজ তো কিছু দেখাতে পারবো না। আমাকে যে এক্ষুণি বেরোতে হচ্ছে।" সকলে সমস্বরে বলে উঠল, "কোথায় ছোড়দাদু! কোথায় যাবে তুমি!"

"এই দ্যাখ না, স্বর্গ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র ডেকে পাঠিয়েছেন। ওখানে দেবাসুরের মধ্যে ভীষণ লড়াই বেঁধেছে। আমাকে গিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তোরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। গোটাকতক অসুর মেরেই

আমি ফিরে আসব। এসে তোদের যুদ্ধের গল্প বলব ক্ষণ।” বলতে বলতেই ছোড়দাদু ভ্যানিশ। সবাই এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। কোথায় গেল মানুষটা! হঠাৎ শোনা গেল – “মার-মার! ধর-ধর! কাট-কাট!” কী ভীষণ শোরগোল! সবাই তো খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। ও কিসের আওয়াজ! হঠাৎ ঘরের মাঝখানে কোত্থেকে একটা কাটা মুন্ডু খসে পড়ল। মাথায় বড় বড় শিং। রাক্ষসের মুন্ডু! সকলে চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে, “ছোড়দাদু! কোথায় তুমি?” অদৃশ্য ছোড়দাদু উত্তর দিলেন, “ভয় পাস না। এক্ষুণি আসছি আমি।” বলতে বলতেই কোত্থেকে একটা কাটা হাত এসে পড়ল। তারপর একটা কাটা পা। সকলের তো ভয়ে দাঁতকপাটি লাগার যোগাড়।

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল ছোড়দাদুর গলা, “কিরে! এতেই ভয় পেয়ে গেলি! তবে যে বললি নতুন কিছু দেখবি!” ঘরের আলোটা একজন জ্বালিয়ে দিতেই সকলে দেখতে পেল, ছোড়দাদু নিজের জায়গাতেই বসে মিটিমিটি হাসছেন।

ছোড়দাদুর এক বন্ধু ছিল। তাঁর নাম ছিল ভুবন। বিহারের ছাপড়া জেলায় ছিল তাঁর বাড়ি। থাকতেন এখানেই। আমাদের বাড়িতে তখন বেশ কিছু আশ্রিত বাস করত। আস্তাবলের পেছন দিকটায় ছিল সেইসব আশ্রিতদের ঘর। ভুবনদাদুও সেখানেই থাকতেন। ভুবনদাদু ছিলেন ঘোরতর ভূত অবিশ্বাসী। ভগবানে বিশ্বাস থাকলেও ভূতে

ছিল তীব্র অবিশ্বাস। এই নিয়ে ছোড়দাদুর সাথে অনেকবার বাকবিতন্ডাও হয়েছে। একদিন ভরা আসরে ছোড়দাদু প্রতিজ্ঞা করলেন, "ভুবনকে আমি ভূতে বিশ্বাস করিয়েই ছাড়ব।" সবাই বলল, "কিভাবে হবে ব্যাপারটা?"

ছোড়দাদু হাসতে হাসতে বললেন, "দ্যাখ না! শুধু দেখে যা তোরা, কি করি আমি।" ভুবনদাদু তো কটমট করে তাকিয়ে রয়েছেন ছোড়দাদুর দিকে। ছোড়দাদুও হাসি হাসি মুখ করে ওঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। হঠাৎ ছটফট করে উঠলেন ভুবনদাদু। পেটটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে আস্তাবলের দিকে দৌড়োলেন ভুবনদাদু। ছোড়দাদু তো সঙ্গে সঙ্গে দুজনকে পাঠালেন, "শিগগিরই যা, দ্যাখ ও কি করে। চুপি চুপি যাবি। তবে দেখিস, যেন পায়খানায় ঢুকে পড়িস না ওর সঙ্গে।"

এদিকে ভুবনদাদু তো খাটা পায়খানায় ঢুকে পড়লেন। লোকদুটো বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিছু একটা মজা দেখার আশায়। কী মজা দেখবে, সেটা অবশ্য জানে না। হঠাৎ পায়খানার মধ্যে থেকে গোঁ গোঁ শব্দ। ভুবনদাদু অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ওরা ভুবন দাদুকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ছোড়দাদুর কাছে গেল। একটু পরে, চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে ভুবনদাদু তো উঠে বসলেন। তারপরেই ভেউ ভেউ করে কি কান্না! "আছে, আছে! ভুত আছে... আমি নিজের চোখে দেখেছি রে বিনোদ ভাই।" ছোড়দাদু বললেন, "কি দেখলি রে ভুবন?"

"দেখলাম, পায়খানার চাতালে একটা ঝাঁটার কাঠি পড়ে রয়েছে। গজগজ করে তোমায় খুব গাল দিচ্ছিলাম। হুঁ! আমায় নাকি ভূত দেখাবে! নিকুচি করেছে তোমার ভূতের। হঠাৎ দেখি, কাঠিটা লাফিয়ে উঠল চাতাল থেকে। তারপর একটা গোঁফের আকার নিল। আমি হাঁ করে দেখছি, কি হচ্ছে ব্যাপারটা। গোঁফ থেকে এবার এল দুটো চোখ। তারপর মুখ, কান, নাক, শেষে একটা মুন্ডু হয়ে গেল। আমার নাকের ডগায় দুলতে দুলতে মুন্ডুটা বলতে লাগল, 'ক্যায়া ভুবন বাবু! ভুত নেহি হ্যায়!' এটা দেখেই তো আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।"

সব শুনে ছোড়দাদু বললেন, "তাহলে! ভুত আছে তো!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। খুব আছে। যা দেখলাম আমি, ওরে বাবা!"

"না। নেই।" ছোড়দাদু এবার বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভূত সত্যিই নেই। ওটা আমিই তোমাকে দেখিয়েছি। মুন্ডু নাচানোটা আমারই এক কৌশল। তুমি তো ভয় পাওনা। তাই তোমার সঙ্গে একটু মজা করেছি মাত্র। আর কিছু না।"

সবটা শুনে ভুবনদাদু তো রেগে কাঁই, বললেন, "আমি আর থাকবোই না এখানে।" তবে সত্যিই তিনি ছাপড়ায় ফিরে গিয়েছিলেন কিনা, সেটা আর জানা নেই আমার।

এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম। হঠাৎ কারেন্ট চলে আসায় চমকে উঠলাম। সেটা দেখে হাসতে হাসতে বাবা বললেন, "যাই, ক্লাবে গিয়ে একটু আড্ডা মেরে আসি।" ■

অণুলিখন

সেদিনের সাঁতরাগাছি স্টেশন

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

কিছুদিন আগে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভেসে আসা পুরানো সাঁতরাগাছি স্টেশনের একটি ছবি দেখে, মনে পড়ে যাচ্ছিল অনেক কথা। তখন সবে ওখানের লাইনগুলোর পাশে পাশে বিদ্যুতের খুঁটি পোঁতা শুরু হয়েছে। বাবা প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরার সময় খবর নিয়ে আসতেন – কতদূর পর্যন্ত খুঁটি এগিয়ে এসেছে। এরপর একদিন কয়লা, ডিজেল, আর বৈদ্যুতিক ট্রেন তিনটেই সাঁতরাগাছি দিয়ে চলতে শুরু করল।

যখন প্রথম ই.এম.ইউ. কোচ চালু হল, তখন আমাদের বন্ধুদের মধ্যে প্রায়ই তর্ক বেঁধে যেত – কে ক'টা ইলেকট্রিক ট্রেন দেখেছি তাই নিয়ে। ন্যাশনাল প্লেসে থাকাকালীন সময়ে, কখনও কখনও পুরো বিকাল কেটে গেলেও, সেই বিতর্কের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান হতনা। অবশেষে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে মা-কে সালিসি মেনে, আমার আস্ফালনটি ধীরে ধীরে প্রশমিত হত।

যখন সাঁতরাগাছি আর ট্রেনের কথাই উঠল, তখন পুরানো সাঁতরাগাছি স্টেশন চত্বর সম্পর্কেও আরও কিছু কথা আজ বলতেই হচ্ছে। সাঁতরাগাছি চিরকালই জংশন বলে পরিচিত, কিন্তু সেই ষাঠের দশকে বা তার আগে, একমাত্র শালিমার ওয়ার্ড-টার দিকে একটা শাখা এবং (তৎকালীন) রেমণ্ড

অণুলিখন

কারখানার জন্য একটি সিঙ্গল লাইন ছাড়া বাকী সব লাইনই হাওড়া থেকে খড়গপুর-এর বা মৌরিগ্রামের দিকে চলে যেত।

স্টেশনের অদূরেই আজও বাকসাড়া বাজারের লেভেল-ক্রসিংটি স্বমহিমায় বিরাজমান। এই জায়গাটি চিরদিনই ভারতীয় রেলের একটি অন্যতম ঘাতক স্থল হিসাবে কুপ্রসিদ্ধ। ছোটবেলায় প্রতি রবিবার সকালে সাইকেল চড়ে বাবার সাথে বাজারে যাবার জন্য বায়না ধরতাম। অবাঙালি এক গেট-ম্যান-কাকার সাথে পরিচিতির সুবাদে, বাবা আমাকে তাঁর কেবিনের সামনে ট্রেন দেখার জন্য বসিয়ে দিয়ে বাজার করতে চলে যেতেন। আমি বসে বসে ট্রেন দেখতাম, আর গুণতাম।

ফুলেশ্বর থেকে শিবুকাকা, জগাছা হয়ে, সকালে আসতেন আমাদের পাড়ায় বাড়ি বাড়ি দুধ দিতে। সেই রবিবারটায় ট্রেনের কিছু গোলমাল থাকায়, ওঁর অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমি গেট-ম্যান-কাকার কেবিনের সামনে বসে আছি, এমন সময় দেখলাম, দু'হাতে মস্ত দুই দুধের ক্যান নিয়ে, ঘাড় ঝুঁকিয়ে শিবুকাকা জগাছার দিক থেকে ছুটতে ছুটতে ক্রসিং দিয়ে বাকসাড়ার দিকে আসছেন। পরমুহূর্তেই গেট-ম্যান-কাকা আমার পিছন থেকে খুব জোরে চীৎকার করে হিন্দীতে কি যেন একটা বলে উঠলেন। তাঁর আওয়াজ শুনে অনেকেই বাজারের দিক থেকে গেটের পাশ দিয়ে লাইনগুলোর মাঝের দিকে দৌড়ে গেল। সবাই 'গেল গেল' বলছিল... আমি শুধু দেখলাম মেড্রাস-হাওড়া মেল হাওড়ার দিকে তীর বেগে ছুটে গেল। বাবা দৌড়ে এসে আমাকে টেনে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। শিবুকাকা আর কোনদিন দুধ দিতে আসেননি... ■